পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

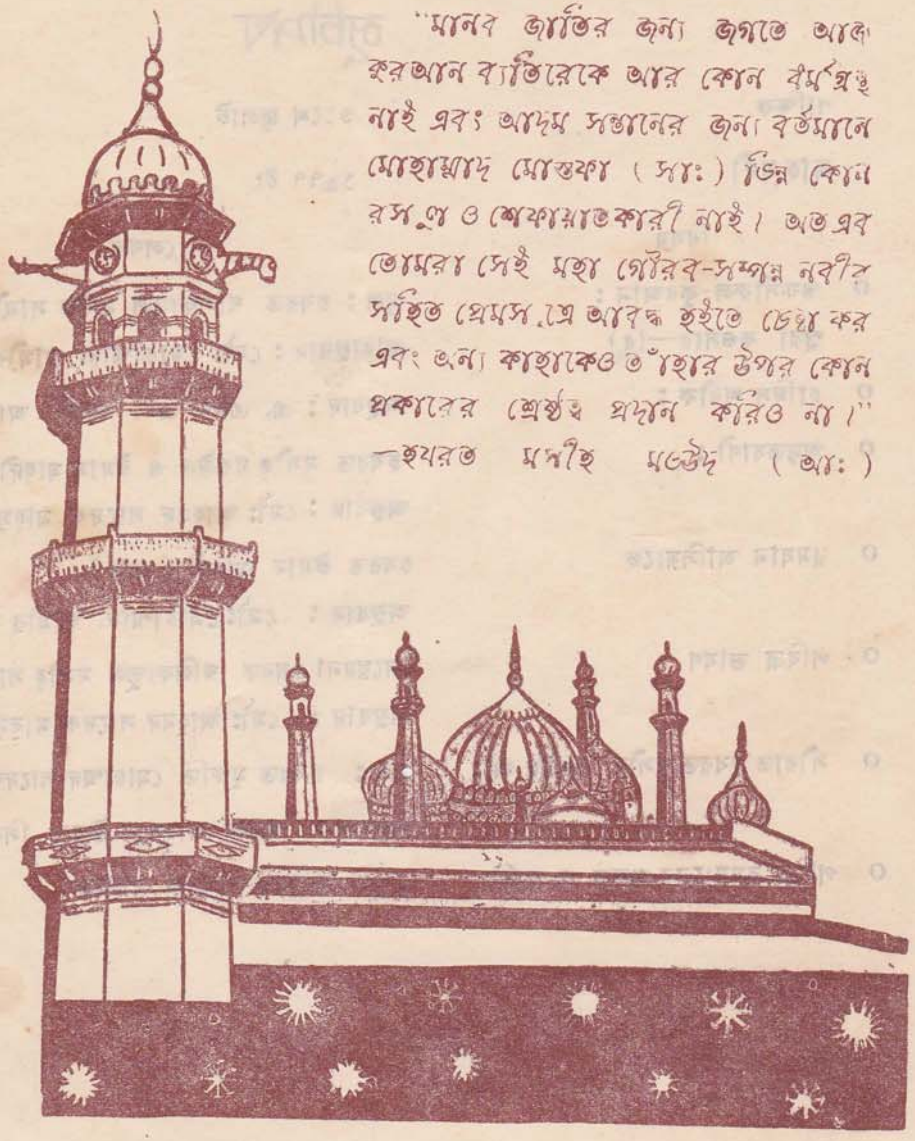

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ ১৩৮৪ বাংলা : ৩১শে ~~আগষ্ট~~ জুলাই ১৯৭৭ ইং : ১৩ই শাবান ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে জুলাই
১৯৭৭ ইং

৩১শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা কওসার—(৫)	মুল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, (সদর মুরুব্বি)	১০
০ রমযান আসিয়াছে	হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১১
০ পবিত্র ভাষণ	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, (সদর মুরুব্বি)	১২
০ সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ আঃ	মুল : হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) অনুবাদ : জনাব আহ্‌সান উল্লাহ সিকদার	১৭
০ পবিত্র রমযানের গুরুত্ব ও কর্তব্য	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৪

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ ১৩৮৪ বাং : ৩১শে জুলাই ১৯৭৭ ইং : ৩১ শে ওফা ১৩৫৬ হিজরী শামসী

জিল্লুর রহমান খান

'তফসীরে কবীর'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) দুশমনের সহিত হযরত মূসা (আঃ)-এর কওমের প্রথম মোকাবেলার সুযোগ ঘটে লোহিত সাগরে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন যুদ্ধ হয় নাই। বনি ইসরাইল ভাগিয়া চলিয়া আসিতেছিল। তাহাদের অস্ত্রের ভয়ে কাঁপিতেছিল, কে'ন সময়ে না জানি ফেরাউন পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। যখন তাহারা দেখিল সত্য সত্যই ফেরাউন তাহার লস্কর সমেত পিছনে আসিয়া হাজির, তখন তাহারা শঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল انا لمدركون "(হে মূসা!) আমরা নিশ্চয় ধরা পড়িয়া গিয়াছি।" এই আচরণ দ্বারা তাহারা কোনো সাহসের পরিচয় দেয় নাই। পরবর্তী অন্য এক ক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ করার প্রশ্ন উঠিল এবং হযরত মুসা (আঃ) তাহাদিগকে দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন, তখন তাহারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। অথচ কেনান যে এলাকা তাহাদিগকে জয় করিতে বলা হইয়াছিল, উহা এক ছোট এলাকা ছিল, যাহার আয়তন ছিল মাত্র দুই তিন হাজার বর্গ মাইল। পক্ষান্তরে সারা ফিলিস্তিনের আয়তন ছিল দশ হাজার বর্গ মাইল। খোদাতায়ালা বনি ইসরাইলকে এই দশ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে মাত্র দুই তিন হাজার বর্গ মাইল এলাকা যুদ্ধ করিয়া জয় করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু কুরআন এবং বাইবেল উভয় গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, যখন হযরত মুসা (আঃ) তাহার কওমকে বলিলেন "তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যের বহু জ্বলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছ, এখন তোমরা অগ্রসর হও এবং কেনানের ছোট এলাকাকে দখল করিয়া সেখানে আল্লাহ্—

তায়ালার বাদশাহাত কায়েম কর।" যুদ্ধ করিবার আদেশ শুনিয়া তাহারা বলিল, اذهب وربك فقاتلا انا هٰهنا قاعدون "তুমি এবং তোমার রব গিয়া যুদ্ধ কর এবং দেশ জয় করিয়া আমাদিগকে দাও, আমরা গ্রহণ করিব। আমরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি। তুমি বলিতে যে, খোদা তোমাকে এই এলেকা দিবেন। এখন ইচ্ছা হইলে তিনি দেন, আমরা কেন খামাখা লড়াই করিয়া মরিব। তিনি কি এ দেশ দিবার ওয়াদা করেন নাই?" (সুরা মায়েদা-৪র্থ রুকু) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হযরত মুসা (আঃ)-এর সহিত তাহাদিগের ৮/১০ বৎসরের সহচার্য তাহাদিগের মধ্যে এতটুকু দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারে নাই যে, খোদাতায়ালার ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য বান্দার পক্ষ হইতেও কিছু না কিছু করার প্রয়োজন আছে। হযরত মুসা (আঃ)-কে তাহারা পরিষ্কার জবাব দিয়া দিল। "হে মুসা! তুমি এবং তোমার রব গিয়া দুশমনের সঙ্গে লড়াই কর। আমরা সূচাগ্র পরিমান যমীনও আগাইব না। আমরা এইখানেই দর্শক হিসাবে বসিয়া থাকিব। যুদ্ধে জয় হইলে দেশ পাইব, হারিলে ক্ষতি নাই, আমরা জীবনে বাঁচিয়া যাইব।

অন্য দিকে দেখা যায়, মদিনায় যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) সংবাদ পাইলেন যে, মক্কা-বাসীদের এক বাণিজ্যিক কাফেলা শ্যামদেশ হইতে ফিরিবার পথে তাহাদিগের সহিত যে যে কবিলার সহিত সাক্ষ্যাৎ হইতেছে, তাহাদিগকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া আসিতেছে, তখন তিনি তাহাদের এই অপচেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য কিছু সংখ্যক লোক সঙ্গে লইয়া সেই কাফেলাকে লক্ষ্য করিয়া মদিনা ত্যাগ করিলেন। মক্কার কাফেলাটি ছোট হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভয়ঙ্কর। তাহারা সারা আরবকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইয়া তাঁহাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত তাঁহার সকল সাহাবা (রাঃ আঃ) যান নাই, কারণ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, এক ছোট কাফেলার দুষ্কৃতি বন্ধ করিবার জন্য অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন নাই। মক্কার কাফেলাকে দমন করিবার উদ্যম গ্রহণ করায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আর এক উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহাদের পরিণাম দেখিয়া যেন আরবের কবিলাগুলি মুসলমানগণকে আক্রমণ করিতে সাহস না করে। যাহা হউক এই যাত্রায়, যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ও দূরবর্তী আশঙ্কও ছিল না। সুতরাং সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর ইহাতে যোগদানের কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু মধ্যেপথে আল্লাহতায়ালা ইলহাম যোগে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে জানাইলেন যে, মক্কা হইতে একটি বড় লস্কর উক্ত কাফেলাকে সাহায্য করিবার জন্য ধাইয়া আসিতেছে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে নিষেধ করিয়া দিলেন তিনি যেন তাঁহার সঙ্গীগণকে এখন এ খবর না

দেন। কারণ এখন তাহাদের পরীক্ষার সময়। আঁ-হযরত (সাঃ) আগে বাড়িয়া যাইতে লাগিলেন। যখন তিনি কয়েক মনযিল পার হইয়া গেলেন, তখন সাহাবা (রাঃ-আঃ)-কে একত্রে জমা করিয়া তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্তায়ালা আমাকে জানাইয়াছেন যে, দুশমনের এক খুব বড় লস্কর মক্কা হইতে আসিতেছে। আল্লাহ্তায়ালা হয় এই লস্করের সহিত অথবা শ্যামদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী কাফেলার সহিত তোমাদের মোকাবেলা করিয়া দিবেন।" তখন পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে সঠিকভাকে জানান নাই যে, কোন পক্ষের সহিত তাঁহাদের মোকাবেলা হইবে। যখন তিনি আরও কতকদূর অগ্রসর হইলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দিলেন যে, মক্কা হইতে আগমনকারী দলের সহিত তাঁহাদের মোকাবেলা হইবে, শ্যামদেশ হইতে আগমনকারী দলের সহিত নহে। মক্কার দল সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ছিল এবং শক্তিতেও তাহারা বহুগুণে প্রবল ছিল। তাহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং পূর্ণ মাত্রায় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। বাকী সভ্যতার দিক দিয়া উভয় পক্ষ একই পর্যায়ের ছিল। উভয় পক্ষই আরববাসী ছিল। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ)-এর যামানায় কেনান দেশীয় লোক যাযাবর জাতি ছিল এবং বনি ইসরাইল এক সুসভ্য এবং সংঘবদ্ধ জাতি ছিল। অর্থাৎ কেনান দেশীয় লোকেরা জাহেল এবং অশিক্ষিত ছিল এবং বনি ইসরাইল সুসংহত এবং সুসভ্য ছিল। তবুও যুদ্ধের প্রশ্নে তাহারা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিয়া বসিল। পক্ষান্তরে মক্কাবাসী সমাগত লস্কর যোদ্ধা হিসাবে সকল দিক দিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগামীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান ছিল। মক্কাবাসী লস্কর সংখ্যায় এক হাজার ছিল এবং তাহারা সকলেই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ছিল এবং তাহাদের সঙ্গে অশ্বও ছিল। মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা মদীনাবাসী ছিলেন, তাহারা কোন বিশেষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নাই। মুসলমানদের তেমন অস্ত্র শস্ত্র ছিল না এবং তাহাদের সঙ্গে মাত্র একটি ঘোড়া ছিল। মোট কথা মক্কাবাসী লস্করের সহিত মুসলমানগণের মোকাবেলার বাহ্যিক কোন দূরবর্তী যোগ্যতাও ছিল না। এইরূপ অবস্থায় যখন আঁ-হযরত (সাঃ) সকলকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, "আমাকে এখন সুনিশ্চতভাবে জানানো হইয়াছে যে, মক্কা হইতে আবু জেহেলের নেতৃত্বে যে লস্কর আসিতেছে, উহার সহিত আমাদিগের মোকাবেলা হইবে। এখন আপনাদিগের কি অভিমত তাহা বলুন।" মোহাজেরগণ একের পর এক খাড়া হইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা লড়িব।" যতই একের পর এক মোহাজের খাড়া হইয়া যুদ্ধ করিতে সম্মতি জানাইয়া যাইতে লাগিলেন, হযরত রসুল করীম (সাঃ) ততই বার বার জিজ্ঞাসা

করিয়া যাইতেছিলেন, "আপনাদের রায় কি বলুন" উপস্থিত মদীনাবাসী আনসারগণ এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিতেছিলেন মক্কা হইতে আগত লস্কর সকলেই মোহাজেরগণের ভাইবেরাদর এবং আত্মীয় স্বজন। এমতাবস্থায় তাঁহারা যুদ্ধ করিবার আগ্রহ দেখাইলে, মোহাজেরগণ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের প্রতি আনসারগণের ভালবাসা নাই। সেই জন্য তাহারা মোহাজেরগণের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জোশ দেখাইতেছে। কিন্তু একই অভিমত বহু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ-আঃ)-এর নিকট হইতে পাওয়া সত্বেও যখন আঁ-হযরত (সাঃ) বার বার অভিমত চাহিতে লাগিলেন, তখন এক আনসারী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মনে হয়, আপনি আনসাগণের নিকট হইতে অভিমত জানিতে চাহেন। কারণ এ যাবৎ যথেষ্ট অভিমত দেওয়া হইয়াছে।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন।" তখন সেই আনসারী বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের ৭২ জনের সর্ব প্রথম প্রতিনিধিদল মক্কায় গিয়া যখন আপনার নিকট বয়াত গ্রহণ করে, তখন আমরা আপনার সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিলাম যে, দুশমন যদি মদিনায় আপনার উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমরা আমাদের জান ও মাল দিয়া আপনাকে রক্ষা করিব। কিন্তু মদিনার বাহিরে আপনার সহিত দুশমনের সংঘাত হইলে, আমাদিগের কোন দায়িত্ব থাকিবে না। কারণ তখন আমাদের এমন শক্তি ছিল না যে, বাহিরে গিয়া আপনার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করি। এখন যখন আপনি বার বার অভিমত চাহিতেছেন, তখন মনে হইতেছে আপনি সেই চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। কারণ এই যুদ্ধ মদিনার বাহিরে সংঘটিত হইতে চলিয়াছে।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন।" তখন সেই আনসারী বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! যখন আমরা আপনার সহিত সেই চুক্তি করিয়াছিলাম, তখন আপনার মর্যাদা আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। কিছুকাল যাবৎ আপনার সহ-চার্যে থাকিয়া আমরা আপনার উচ্চ আখলাক এবং আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন আপনার গৌরবন্বিত মর্যাদা আমাদিগের নিকট সুপ্রকাশিত। সুতরাং এখন আর কোন চুক্তির প্রশ্ন নাই। হে আল্লাহ্‌র রসুল! অদূরে ঐ সমুদ্র। (বদরের ময়দানের অদূরে লোহিত সাগর অবস্থিত ছিল এবং মরুবাসী আরবগণ সাঁতার জানিত না এবং তাহারা পানিকে ভয় করত।) আপনি যদি আমাদিগকে ঘোড়া দৌড়াইয়া সমুদ্রে নামিতে বলেন, আমরা সে আদেশ পালনেও প্রস্তুত, আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না।" তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! যুদ্ধ যদি নির্ধারিত

হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আপনার ডাহিনে লড়িবে, আমরা আপনার বামে লড়িব, আমরা আপনার সম্মুখে ভাগে লড়িব এবং আমরা আপনার পশ্চাৎভাগেও লড়িব। দুশমন আমাদের লাশ না ডিংগাইয়া আপনার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না।" একদিকে এই চিত্রকে সামনে রাখুন এবং অন্য দিকে হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমের ঘটনাকে সামনে রাখুন, যখন তাহারা যুদ্ধের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "হে মুসা! তুমি এবং তোমার রব গিয়া যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আমরা এই খানেই বসিয়া থাকিব।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কওম এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমের মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য! মনে হয় যেন আল্লাহতায়ালা সেই আনসারীর মনে এই খেয়াল জাগাইয়া দিয়াছিলেন যে আঁ-হযরত সাঃ) যেন মনে না করেন যে, তাঁহার উম্মতও মুসা (আঃ)-এর উম্মতের ন্যায় পিছু হটিয়া যাইতেছে। সেই আনসারী বলিলেন "হে আল্লাহর রসুল! আমরা হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমের ন্যায় এ কথা বলিব না যে, তুমি এবং তোমার রব গিয়া দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব। বরং আমরা আপনার ডাহিনে লড়িব, আমরা আপনার বামে লড়িব, আমরা আপনার সম্মুখে লড়িব, আমরা আপনার পশ্চাৎভাগে লড়িব। যদি দুশমন আমাদের লাশ ডিংগাইয়া যায়, তবে পৃথক কথা, কিন্তু আমরা জীবিত থাকিতে তাহারা আপনার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। এই পার্থক্য মুসা (আঃ)-এর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরাট শ্রেষ্ঠত্বকে সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার সাহাবা (রাঃ আঃ) -এর মধ্যে অল্প কয়েক বৎসরের সাহচর্যে কি বিরাট আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও অপূর্ব সাহসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, উপরে আলোচিত ঘটনা তাহার এক প্রকৃষ্ট নমুনা। যাহারা পানি দেখিলে ভয় পাইত, তাহারা সমুদ্রে ঘোড়া দৌড়াইতে চাহে এবং যাহারা যুদ্ধ জানিত না, তাহারা এক দুর্ধর্ষ লস্করের সহিত মোকাবেলা করিতে এবং জীবন দিতে প্রস্তুত। কি মহা পরিবর্তন।

(৮) হযরত মুসা (আঃ)-এর কওম যখন তাঁহাকে বলিলেন, "হে মুসা! তুমি এবং তোমার রব গিয়া যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব।" তখন আল্লাহতায়ালা বলিলেন, "হে মুসা! তোমার কওম বড়ই বেয়াদবি করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে আমার ওয়াদাকৃত বিজয় হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলাম। যাও চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াও এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে থাক। অতঃপর আল্লাতায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এতদানুযায়ী হযরত মুসা (আঃ)-এর কওম চল্লিশ বছর দিশাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া

বেড়াইবার পর কেনান দেশ প্রাপ্ত হয়। অথচ আঁ-হযরত (সা.)-এর ওফাতের ১২ বৎসরের মধ্যেই মুসলমানগণ তৎকালীন সারা সভ্য জগতের উপর আধিপত্য লাভ করেন। ইহাও এক বড় ফজিলত, যাহা হযরত মুসা (আঃ)-এর অাঁ-হযরত (সাঃ) রাখেন।

(৯) হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর হযরত মোহাম্মদ আর এক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। হযরত মুসা (আঃ)-এর সিলসিলা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে. কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সিলসেলা শেষ হইবার নহে। অবশ্য মুসা (আঃ)-এর সিলসেলা হযরত ইসা (আঃ)-এর যামানা পর্যন্ত চালু ছিল এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমন পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত পৌঁছে। উহার বর্তমানতা নামে মাত্র ছিল। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই. খৃষ্টানগণ তাঁহাকে হযরত মুসা (আঃ) অপেক্ষা বড় এবং খোদার পুত্র বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদ মর্যাদা ও পরিচয় অক্ষুন্ন রহিয়াছে এবং তাঁহার সেলসেলা কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে।

(১০) হযরত মুসা (আঃ)-এর শেষ মণ্ডলি অর্থাৎ খৃষ্টান জামাত হযরত মুসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে এবং তাঁহাকে বিদায় দেয়। হযরত ঈসা (আঃ) এমন কতকগুলি দ্বার্থবোধক কথা বলেন, যদ্বারা তাহারা বিভ্রান্ত হয় এবং যিনি তাহাদের মূল শরীয়তদাতা তাঁহাকেই ছাড়িয়া বসে। তাহারা ভাবিয়া দেখিল না অনুগামী ঈসা (আঃ) গুরু হযরত মুসা (আঃ) হইতে কিভাবে বড় হয়। অনুগামী গুরুর বিধানকে সাব্যস্ত করিতে আসিয়া, কিভাবে উহাকে বদলায় বা বাতিল করে?

পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শেষ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদী মসিহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ছোট একটি কথায় আঁ-হযরত (সাঃ)এর সহিত তাঁহার সম্পর্ক পরিচয় ও মর্যাদাকে সন্দেহাতীত করিয়া দিয়াছেন:

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

"তিনিই সব, আমি কিছুই না। বাস, ইহাই একমাত্র মীমাংসা" অর্থাৎ আমার যাহা কিছু কামালাত হাসেল হইয়াছে, তাহা আঁ-হযরত (সাঃ-এর গোলামীর কল্যাণে। আমি তাঁহার মোকাবেলায় কোন বস্তুই না। কথিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিজেকে খোদার পুত্র বলিয়াছিলেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আখেরী খলিফা আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা একান্ত বিনয়ের সহিত বলিয়াছেন:

"তিনিই সব, আমি কিছুই না; বাস! ইহাই একমাত্র মীমাংসা।" অর্থাৎ "আমার প্রভু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত আমার কোন তুলনা হয়না।"

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এক কবিতা আছে, লোকে যাহার উপর আপত্তি করে। আমি উহা পাঠে বড় আনন্দ পাই। তিনি বলিয়াছেন,

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

"ইবনে মরিয়ম (ঈসা)-এর আলোচনা ছাড়। আহমদের গোলাম তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" লোকে বলে এতদ্বারা তিনি নিজেকে ইবনে মরিয়মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অথচ তিনি নিজেকে ইবনে মরিয়মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেন নাই। তিনি আহমদের গোলামকে ইবনে মরিয়মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এই দুইটি কথার মধ্যে প্রভেদ অনেক। এখানে আহমদ বলিতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছেন। সুতরাং তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলামও হযরত ঈসা (আঃ) অপেক্ষা বড়। যাঁহার গোলাম হযরত ঈসা (আঃ) অপেক্ষা বড়, তিনি স্বয়ং তাহার চেয়ে নিশ্চয় বহুগুণ বড়। হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইহাও এক বড় ফযিলত যে হযরত মুসা (আঃ)-এর শেষ খলিফার জামাত হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাহাদের ধর্ম প্রবর্তকের চেয়ে উচ্চতর স্থান দিয়া বসে কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আখেরী খলিফা তাঁহার প্রভুর গৌরব ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন এবং কায়েম করিয়াছেন। তিনি সারা বিশ্ববাসীর নিকট বড় জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি যাহা লাভ করিয়াছেন, সে সকলই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কল্যাণ হইতে পাইয়াছেন।

(১২) হযরত মুসা (আঃ)-এর পর যত নবী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে নবুওত লাভ করেন নাই সকলেই আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি নবুয়ত লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কোন নূতন শরীয়ত ছিল না, তাঁহারা হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতের পরিচালনা হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়ত ধরিয়াই করিতেন। কিন্তু এই শরীয়তের অনুগমন কাহাকেও নবুওতের মোকামে উন্নীত করিতে সক্ষম ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই ফজিলত ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর নবুওত লাভ করিতে হইলে, একমাত্র তাঁহার অনুগমন ও তাঁহার ফয়েয দ্বারাই সম্ভব। যদিও হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুগামী ছিলেন, কিন্তু নবুওত লাভ করিয়াছিলেন সরাসরিভাবে। হযরত মুসা (আঃ)-এর শিক্ষার মধ্যে এ গুণ ছিল না যে উহার অনুগমন কাহাকেও নবুওতের মর্যাদায় উন্নীত করে। কিন্তু কুরআন মজিদের এ বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহার অনুগমন করিয়া মানুষ নবুওতের মর্যাদাও লাভ করিতে পারে। কিন্তু যিনি নবুওত লাভ করিবেন, তাহাকে কুরআন মজিদ ও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অধীনই থাকিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যের আহব্বান ও প্রচার, ওয়াজ ও উপদেশ, ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিশেধ এবং উত্তম কাজের পথনির্দেশ

(১০১) হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন :

"খোদার কসম, তোমার দ্বারা কোন একজন ব্যক্তিরও হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া, তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট লাল বর্ণের উঁট পাওয়া অপেক্ষাও শ্রেয়।" (মুসলিম)

(১০২) হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন: "যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ এবং হেদায়েতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহাকেও ততটুকু সওয়াব দান করা হইবে, উহার উপর আমলকারী যতটুকু সাওয়াব লাভ করিবে, এবং তাহাদের উভয়ের সওয়াবে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিবে না। তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ এবং পথভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহারও ততটুকই গোনাহ্ হইবে, যতটুকু গোনাহ্ সেই মন্দকাজ সম্পাদনকারীর হইয়া থাকে এবং ইহায় তাহার গোনাহ্তে কোন ত্রুটি ঘটিবে না।" (মুসলিম)

(১০৩) হযরত মায়ায (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) আমাকে রাষ্ট্রনায়ক করিয়া প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন : তোমাকে অনেক সময় আহ্‌লে কেতাব (খ্রীষ্টান ও ইহুদী) গণের সম্মুখীন হইতে হইবে। তুমি তাহাদিগকে তখন এই কথার প্রতি আহ্বান জানাইবে যে, তাহারা যেন সাক্ষী দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাঃ আঃ) আল্লাহ্‌র রসুল। যদি তাহারা তোমার এই কথা মানিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয করিয়াছেন। যদি তাহারা তোমার এই কথা কবুল করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের উপর সাদকা (অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী) দেওয়া ফরয করিয়াছেন, যাহা তাহাদের বিত্তবানদের নিকট হইতে লওয়া হইবে এবং তাহাদের দরীদ্রদিগকে দান করা হইবে। যদি তাহারা ইহাও মানিয়া লয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে

তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল লওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবে। মজলুমের দোওয়া হইতে বাঁচিও, কেননা মজলুমের দোওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে কোন ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকতা নাই। অর্থাৎ, উহা সরাসরি আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছায় এবং কবুল হইয়া যায়।"

(বোখারী)

(১০৪) হযরত আনাস (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাঃ আঃ) বলিয়াছেন: "মানুষের জন্য সহজ সরল অবস্থার সৃষ্টি করিবে, অসুবিধা ও কাঠিন্যের সৃষ্টি করিবে না; তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিবে, নিরাশ করিবে না।" (মুসলিম)

১০৫। হযরত আবু সায়ীদ খুদ্রী (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শোনিয়াছি:

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কদর্য জঘন্য বিষয় দেখে এবং তাহার ক্ষমতা আছে, তবে সে স্বহস্তে তাহা রোধ করিবে এবং তাহার ক্ষমতা না থাকিলে মুখে বোধ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি এইটুকু ক্ষমতাও না থাকে, তবে মনে মনে খারাপ জানিবে। ইহা ঈমানের নিম্নতম মান।'

১০৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রাযিঃ) বলেন যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছের:

"আমার পূর্বে আল্লাহ্তায়ালা যত নবীকেই পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন ঐ সব জাতির মধ্যে প্রত্যেক নবীর কিছু খঁটি সাথী এরূপ ছিলেন, যাহারা ঐ নবীর কর্ম পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতের এবং তাঁহার পূর্ণ অনুবর্তিতা করিতেন। অতঃপর কোনো কোনো এরূপ অযোগ্য ব্যক্তিদের উদ্ভব হইল, যাহারা এমন কথা বলিত, যাহা তাহারা পালন করিত না এবং এরূপ কার্য করিত যাহার আদেশ তাহাদিকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং, যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে স্বহস্তে জেহাদ করে সেও মুমেন এবং যে তাহাদের বিরুদ্ধে মনে মনে জেহাদ করে সেও মুমিন। উহার নিম্নে এক সরিষা ও ঈমানের কোন অংশ নাই।"

('মুসলিম')

১০৭। হযরত আবু হুরায়রা বলেন যে, হযরত ইবনে মাস্য়ূদ (রাযিঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের মধ্যে ওয়ায করিতেন। তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিল, আমি চাই আপনি প্রত্যহ ওয়ায করেন। ইব্নে মাস্য়ূদ রাযি আল্লাহু আন্হু ফরমাইলেন, "আমি চাইনা যে, তোমাদের অবসাদ জন্মে। সেজন্য ফাঁক দিয়া, অবকাশ দিয়া তোমাদের মধ্যে ওয়ায করি, যেমন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অবকাশ দিয়া ফাঁকে ফাঁকে আমাদিগকে ওয়ায শুনাইতেন, যাহাতে আমাদের মধ্যে গ্লানি বা অবসাদের সৃষ্টি না হইতে পারিত।" ('মুস্লিম')

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে ধারাবাহিক অনুবাদ):— এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

৩১শে জুলাই—১৯৭৬ ইং

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

কুরআন কারীমের শান

"কুরআন শরীফ স্বীয় রুহানী প্রভাব ও গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সাক্ষাৎ জ্যোতির দ্বারা আপন সত্যকার অনুসারীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং তাহার হৃদয়কে আলোকিত করে। তারপর, বড় বড় নিদর্শন দেখাইয়া খোদাতায়ালার সহিত তাহার এরূপ সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাহা খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য উদ্যত তরবারিও বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কুরআন শরীফ মানুষের হৃদয়চক্ষুকে উন্মিলিত ও প্রসারিত করে; গোনাহ্র কলুষিত উৎস রুদ্ধ করে: খোদাতায়ালার সুস্বাদু বাক্যালাপ (মুকালামা ও মুখাতাবা)-এর সৌভাগ্যে ভূষিত করে; গায়েবের সংবাদ ও জ্ঞানরাশী প্রদান করে; আল্লাহ্তায়ালা বান্দার দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে স্বীয় বাণীর দ্বারা তাহাকে অবহিত করেন; প্রত্যেক ব্যক্তি যে কুরআন শরীফের সচ্চা অনুসারীর মুকাবেলা করে, খোদাতায়ালা তাঁহার ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া দেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির সঙ্গে আছেন যে তাঁহার এই পবিত্র কালামের অনুবর্তিতা করে।" (চাশমায়ে মা'রেফত, পৃঃ ২৯৪ ও ২৯৫)

"কুরআন শরীফ গভীর মনোনিবেশ ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধি বিবেচনা-সহিত পাঠ করা উচিত। হাদিস শরীফে আসিয়াছে: رب قارئ يلعنه القرآن অর্থাৎ, অনেক এরূপ কুরআনপাঠকারীও আছে যাহাদের উপর কুরআন লা'নত (অভিশম্পাত) করে। কুরআন করীম পাঠকালে যখন পাঠক কোন রহমত সূচক আয়াত অতিক্রম করিবে, তখন তাহার উচিত খোদাতায়ালার নিকট রহমত কামনা করা এবং যেখানে কোন জাতির উপর আযাব বা শাস্তির উল্লেখ থাকে, সেখানে খোদাতায়ালার আযাব হইতে তাঁহার পানাহ্ ও আশ্রায় ভিক্ষা করিবে। মোট কথা, গভীর প্রজ্ঞা ও মনোনিবেশ এবং চিন্তা ভাবনার সহিত কুরআন পড়া উচিত; তারপর, তদনুযায়ী আমল করা উচিত।"

(আল-হাকাম, ২৪শে মার্চ ১৯০৭)

"সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করাও এক ইবাদত।" (আল-হাকাম, ২৪শে মার্চ ১৯০৩)

"যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুসারী এবং যোলআনা পালনকারী না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কোন প্রকারের উন্নতি লাভে সক্ষম হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ তাহারা কুরআন করীম হইতে যতটুকু দূরে সরিতেছে, উন্নতির ধাপ ও পথ সমূহ হইতে তাহারা ততটুকু অপসারিত হইতেছে।" (আল-হাকাম, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫)

অনুবাদ: আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

"যাহার অন্তর এ কথায় আনন্দিত যে, রমযান আসিয়াছে"

"যাহার অন্তর এই কথায় আনন্দিত যে, রমজান আসিয়াছে এবং সে এই প্রতীক্ষায় ছিল, যে রোজা আসিলেই রাখিবে, অথচ অসুস্থতার জন্য সে রোজা রাখিতে পারে না, এইরূপ ব্যক্তি আকাশে রোজা হইতে বঞ্চিত হইবে না। দুনিয়ার অনেক লোক ওজর খুঁজে এবং ভাবে যে, দুনিয়ার মানুষকে আমি যেরূপ ধোকা দিতেছি, সে ভাবে খোদাকেও ধোকা দিতেছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ হইতে মসলা গড়িয়া লয় এবং ওজরগুলিকে শামিল করিয়া মসলাগুলিকে সহি সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার নিকট সেগুলি সহি নহে। ওজরের দ্বার বহু বিস্তৃত। মানুষ চাহিলে এতদ্বারা সারা জীবন বসিয়া নামাজ পড়িতে পারে এবং রোজা একেবারেই না রাখিতে পারে। কিন্তু খোদা তাহার নিয়ত ও ভাবধারা অবগত। যাহার সততা এবং আন্তরিকতা আছে, খোদা জানেন যে, তাহার অন্তরের মধ্যে দরদ রহিয়াছে। খোদা তাহাকে আসল পুণ্য হইতে অধিক দান করেন। কারণ মর্মবেদনা মর্যদার বস্তু। বাহানাকারী ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে কিন্তু আল্লাহতায়ালার নিকট এই ভরসার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোজা রাখিয়া ছিলাম তখন নবীগণের এক দলের সহিত আমি কাশফে মিলিত হই, তাহারা বলিলেন, তুমি নিজের আত্মাকে কেন এত কষ্টে ফেলিয়াছ। এইরূপে যখন মানুষ খোদার জন্য নিজকে কষ্টে ফেলে তখন তিনি স্বয়ং পিতামাতার ন্যায় তাহাকে উহা হইতে বাহির করিয়া সকরুণে বলেন যে, কেন তুমি কষ্টে পড়িয়াছ কিন্তু যে ওজর করিয়া নিজকে কষ্ট হইতে বাঁচায়, খোদা তাহাকে অন্যান্য কষ্টে ফেলেন এবং উহা হইতে তাহাকে বাহির করেন না। পক্ষান্তরে যে নিজকে কষ্টে ফেলে, তাহাকে তিনি স্বয়ং বাহির করিয়া আনেন। মানুষের বর্তব্য যেন সে নিজ আত্মার উপর স্বয়ং অনুগ্রহ না করে বরং সে ক্ষেত্র এইরূপ করে যে, খোদা তাহার আত্মার উপর অনুগ্রহ করেন। মানুষের নিজ আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ, তাহার জন্য জাহান্নাম সদৃশ। ইব্রাহিম (আঃ)এর ঘটনার বিষয় চিন্তা কর। যে ব্যক্তি নিজে আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়, তাহাকে খোদা আসিয়া আগুন হইতে বাঁচান এবং যে স্বয়ং আগুন হইতে বাঁচিতে চায়, তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে পূর্ণ নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং ইহাই ইসলাম যে, যাহা কিছু খোদার রাস্তায় আসে, উহাকে অস্বীকার করিও না। যদি আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ মাহাত্মের চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন তাহ হইলে يعصمك الله من الناس অর্থাৎ "আল্লাহতায়ালা তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন" এই আয়াত নাজেল হইত না। আল্লাহ্‌র হেফাজতের ইহাই গুপ্ত রহস্য।"

(আল হাকাম ১০ই ডিসম্বের, ১৯০২ ইং পৃষ্ঠা ৯)। —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

অনুবাদ : মহতারম মৌঃ মোহাম্মদ,
আমীর, বা, আঃ আঃ

পবিত্র ভাষণ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ হাজার বৎসরের জন্য মুজাদ্দিদ (আদিষ্ট সংস্কারক) হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই অনুযায়ী ইসলামকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার এবং জয়যুক্ত রাখার দায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন উক্ত শেষ হাজারের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদের এই দায়িত্ব পূর্ণ উদ্যমের সহিত পালন করিয়া যাই।

রবওয়া—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) ২৭শে জুন ১৯৭৭ ইং তারিখ ১০ম ফজলে উমর দরসুল কুরআন ক্লাশের উদ্বোধন করিতে গিয়া এ বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেন যে শেষ যুগের ইমাম সৈয়দনা হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ শুধু এক শতাব্দীর নহে বরং দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ (আল্লাহ্‌তায়ালার আদিষ্ট সংস্কারক)। এই হিসাবে আহমদী পুরুষ, স্ত্রীলোক, যুবক, বৃদ্ধ ও বালক সকলের স্কন্ধে ইসলামকে তাহাদের জীবদ্দশায় উজ্জীবিত ও সমুজ্জল রাখা ও বংশপরম্পরায় সঞ্জিবীত রাখা ও সারা বিশ্বে উহার প্রাধান বিস্তার করা এবং শেষ হাজার বৎসরের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ইসলামকে জয়যুক্ত রাখার মহান দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে।

হুজুর (আইঃ) বিশদভাবে বর্ণনা করেন যে, আমরা এই দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পাদনে সক্ষম হইতে পারি না, যতক্ষণ না আমাদের স্ত্রী ও পুরুষ আমাদের ছোট ও বড় সকলই কুরআন করীমকে চরম পর্যায়ে ভালবাসি, উহার জ্ঞানসমূহে বুৎপত্তি অর্জন করি এবং উহার উপর যথাযতভাবে আমল করি; অতঃপর এ সকল গুণ ক্রমাগত ধারায় এক জেনারেশাল হইতে পরবর্ত্তী জেনারেশনে সঞ্চারিত করি। সেই জন্য ইহা নিতান্তই জরুরী যে, শেষ হাজার বৎসর ('আলফে আখের')-এর সমাপ্তি পর্যন্ত উক্ত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে গুণান্বিত বংশধরগণ যেন সৃষ্টি হইতে থাকে এবং তাহারা ঐ সকল গুণের বলে স্ব স্ব যুগে ইসলামকে জয়যুক্ত রাখার মহান কার্যক্রম পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতে থাকে, যাহাতে ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য অক্ষয় ও স্থিতিশীল হইয়া থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, ২৭শে জুন ৭১ ইং হইতে পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠিত ফজলে উমর দরসুল কুরআন ক্লাশে এ বৎসর রবওয়া এবং সারা দেশে বিস্তৃত বিভিন্ন জামাত হইতে ৮৬৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৩৮৯ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৪৮০ জন।

পূর্ণ ভাষণ :

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন: "মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্ব এ কথার উপর নির্ভর করে যে সে কি লাভ করিতে চায়। যত বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাহারও সামনে থাকে, তত বড় দায়িত্ব তাহার উপরে ন্যাস্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, একজন ছাত্র যে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা দিবে তাহার দায়িত্ব সেই ছাত্রের মুকাবিলায় কম হইবে, যে এম, এ পরীক্ষা দিতে চায়। এই ক্ষুদ্র উদাহরণটির দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মানুষের দায়িত্ব তাহার সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দ্বারাই নিরূপিত হয় যাহা সে অর্জন করিতে চায়। তেমনিভাবে রুহানী জীবনেও উদ্দেশ্য অনুযায়ী দায়িত্বাবলীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আবার কতক ব্যক্তিবিশেষ দায়িত্ব থাকে, আর কতক সমষ্টিগত দায়িত্ব। এই পার্থক্যও স্ব স্থানে বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্‌তায়ালা যেহেতু মানবীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতার মধ্যেও তারতম্য রাখিয়াছেন, সেইহেতু উক্ত তারতম্যের কারণেও ব্যক্তি ও সমিষ্টি বা জামাত সমুহের দয়িত্বাবলীর ধরণ ও স্বরূপ বদলাইতে থাকে। তারপর যামানার সীমারেখাও দায়িত্বাবলী নিরূপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি প্রচেষ্টা ও সাধণার যুগ সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে দায়িত্বও সেই তুলনায় সীমিত ধরণের হইবে এবং যদি সেই যুগ দীর্ঘ পরিসরে বিস্তৃত হয় তাহা হইলে দায়িত্বাবলীতেও প্রসারতার সৃষ্টি হওয়া এক স্বাভাবিক ব্যাপার।"

মুজাদ্দিদগণের আগমণ ও তাহাদের দয়িত্বাবলীর স্বরূপ :

দায়িত্বাবলীর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নীতিগত ও বিশদ আলোকপাত করার পর হুজুর বলেন :

'বিগত বার শতাব্দীতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত হাজার হাজার এরূপ মহাপুরুষ সৃষ্টি করিতে থাকেন, যাঁহারা নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতানুযায়ী নিজেদের এলাকা ও যামানার মুনুষের এসলাহ্‌ ও সংস্কার কার্য এবং ইসলামের খেদমত সম্পাদন করিয়াছেন। তেমনিভাবে দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সকল মুজাদ্দিদ আগমন করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের যামানা ও এলাকা সীমিত ছিল। প্রত্যেক মুজাদ্দিদের যামানা শুধু এক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হইত এবং যে এলাকায় সংস্কার কার্যে আদিষ্ট হইতেন, তাহাও সীমিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ওসমান বিন ফৌদি (রহঃ) শুধু পশ্চিম আফ্রিকার

জন্য মুজাদ্দিদ হইয়া প্রেরিত হইয়া ছিলেন। সেখানে তিনি এবং তাঁহার অনুসারীগণ বেদা'ত ইত্যাদির অবসান ঘটাইয়া ইসলামকে উহার আসলরূপে প্রবর্তন করেন এবং ঐ পথে প্রত্যেক প্রকারের মালী ও জানী কুরবানী পেশ করেন। মোট কথা, তাঁহার ধর্মসংস্কার কার্যের যামানা ও এলাকা সীমিত ছিল, অবশিষ্ট জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব ছিল না। বাকী সকল মুজাদ্দিদের বেলায়ও সেই একই অবস্থা ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব যুগে এক এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত 'তাজদীদ ও এহইয়ায়ে-দ্বীনের' কাজ সমাধা করেন।"

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং তাঁহার কার্যকালের পরিসর ঃ

ভাষণ অব্যাহত রাখিয়া হুজুর বলেনঃ

"যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত শুভ সুসংবাদ অনুযায়ী মুজাদ্দেদগণের ধারাবাহিক আবির্ভাবের পর হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব সংঘটিত হইল, তখন তিনি যেমন নিজেও দবী করিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে শুধু একটি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রেরণ করেন নাই বরং তিনি দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ হাজার বৎসরের জন্য মুজাদ্দিদ সাব্যস্ত হইলেন। তেমনি তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে শেষ যুগের ইমাম হিসাবে প্রেরিত হন। সেই জন্যই তাঁহার মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের কার্য্যধারা শুধু এক শতাব্দী পর্য্যন্ত সীমিত নয়, বরং পূর্ণ এক হাজার বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই হাজার বৎসর, মানবজীবনের শেষ হাজার বৎসর কাল। তিনি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহার প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহে ওসাল্লাম হইতে তাঁহারই কল্যাণ ও ফয়েযে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে :-এর আনিত ধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন এবং বিশ্বব্যাপী উহার প্রাধান্য বিস্তারের যে খেদমত তাঁহার উপর ন্যাস্ত হইয়াছে উহার যামানা দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ হাজার বৎসর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন এত দীর্ঘ যুগ তাঁহার সোপর্দ হইয়াছে, এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সমগ্র মানবজাতির স্বীয় রবের সহিত জিন্দা সম্পর্ক কায়েম করা তাঁহার জিম্মাদারী সাব্যস্ত হইয়াছে, তখন ইহা সুস্পষ্ট যে, উহা দুই তিন জেনারেশনের কাজ নয় বরং এ কাজ ত্রিশ চল্লিশ জেনারেশন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলিতে থাকিবে।"

আমাদের দায়িত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি ঃ

হুজুর আকদাস (অইঃ) কুরআন ক্লাশের ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

"হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব যুগ এবং তাঁহার উপর অর্পিত কাজের প্রসারতার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের এ বিষয় কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অনুগামী হিসাবে দুনিয়ার পথপ্রদর্শক হিসাবে নিয়োজিত হইয়াছেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানব জাতিকে ইসলামের আওতাভুক্ত করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামী ও আনুগত্যের অধীনে আনিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত দাসে পরিণত করার পবিত্র কাজ আপনাদের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে, এবং এই 'শেষ হাজার বৎসর' কাল, যাহার মধ্য দিয়া দুনিয়া অতিক্রম করিতেছে, আপনাদিগকে উক্ত কাজ বংশপরম্পরায় করিয়া যাইতে হইবে। সেই অনুযায়ী আপনাদের উপর এবং জামাতে আহ্মদীয়ার ভবিষ্যৎ ত্রিশ চল্লিশটি জেনারেশনের উপর মহান দায়িত্বাবলী ন্যাস্ত হয়। আপনাদিগকে সমস্ত বিশ্ব এবং উহার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে ইসলামের দিকে আনয়ন করিতে হইবে ; তারপর তাহাদিগকে ইসলামে কায়েম রাখিতে হইবে ; বেদায়াত সমূহের দুয়ার রুদ্ধ করিতে হইবে এবং চিরতরে রুদ্ধ রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জন্য ইহা ফরজ করা হইয়াছে যে, আপনারা খোদা ও তাঁর রসুলের কখনও বিশ্বাসভঙ্গকারী (বে-ওফা) হইবেন না, হযরত মোহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঞ্চল পরিত্যাগকারী হইবেন না ; হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমান্যকারী হইবেন না ও তাঁহার কায়েমকৃত জামাত হইতে পরাঙ্মুখ ও পৃথক হইবেন না এবং খেলাফতে-হাক্কা-ইসলামীয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারী হইবেন না। মোট কথা, আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দয়িত্ব এই যে, আপনারা খোদাতায়ালা ও তাঁহার রসুলের সাচ্চা ওফাদার (বিশ্বস্ত) হইবেন, রসুল করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওসাল্লামের আঞ্চলের সহিত নিবীড়ভাবে জড়িত থাকিবেন ; হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যাবতীয় দাবীর উপর বিশুদ্ধচিত্তে ঈমান আনিয়া তাঁহার কায়েমকৃত জামাতের মধ্যে পূর্ণরূপে শামিল থাকিবেন এবং খেলাফতে-হাক্কা-ইসলামীয়ার সহিত অঙ্গাঙ্গী নিবীড় সম্পর্কে কোনরূপ নড়চড় ও দুর্বলতার সৃষ্টি হইতে দিবেন না। তারপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের আসমানী অভিযানে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া অংশগ্রহণ করিবেন। আপনাদের উপর এ দায়িত্বও বর্তায় যে, আপনারা এ সকল গুণে শুধু নিজেরাই গুণান্বিত হইবেন না বরং এই সকল গুণ পরবর্ত্তী বংশধরদের মধ্যেও সঞ্চালিত করিবেন, যাহাতে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও প্রাধান্য বিস্তারের কাজ বংশপরাম্পরায় কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকে।"

মহান দায়িত্বাবলী যথার্থভাবে পালনের উপায় ও কর্ম পদ্ধতি :

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) এ বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, এ সকল মহান দায়িত্ব পালনের উপায় ও পন্থা এই যে, আপনারা কুরআন করীমের সহিত সব চাইতে বেশী অনুরাগ ও ভালবাসা রাখুন, উহার জ্ঞানরাশীতে বুৎপত্তি অর্জন করুন এবং উহার উপর আন্তরিকতার সহিত আমল করুন। ইহা ব্যতিরেকে আপনারা সমগ্র জগতকে ইসলামের দিকে আনয়ন করিতে সক্ষম ও সফল হইতে পারেন না। হুজুর বলেন যে, কুরআন করীমের মধ্যে সমস্ত জগতের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শিতা একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে কুরআন করীম ছাড়া আমাদের আর কোনকিছুর প্রয়োজন নাই। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলিতেছি, কুরআন করীম হইতে যে জ্ঞান, যে সূক্ষ্মদর্শিতা এবং যে বুদ্ধিমত্তা হাসিল হয়, অক্সফোর্ড এবং বিশ্বের অন্যান্য সকল ইউনিভার্সিটি হইতে উহার সহস্রতম এবং কোটিতম অংশও লাভ করা যায় না। সুতরাং কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জনে তৎপর হউন। তারপর সেই জ্ঞানে নিজেরাও শুশোভিত হইয়া সমগ্র জগতকে নেত্রীত্ব ও পথনির্দেশ দানের যোগ্যতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন। আমাদিগকে শুভ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, এক সময় আসিবে যখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সাচ্চা মুসলমানে পরিণত হইবে এবং মানবকুল স্বীয় রাবের পরিচয় লাভ করিবে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে। এ সকল শুভসংবাদ অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমাদের কর্তব্য আমরা যেন জিম্মাদারীসমূহ উপলব্ধি করি, এবং যথার্থভাবে পালনে সমর্থ হই। ইহা আপনাদের এবং আমাদের সকলের পারস্পরিক জিম্মাদারী। আমাদের দায়িত্ব, আপনাদিগকে শিখাই। আপনাদের দায়িত্ব, আপনারা শিখুন। আমাদের দায়িত্ব, কুরআন করীমের যে তফসীর ও ব্যখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এ যুগে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা প্রথমে আমরা নিজেরা শিখি, তারপর আপনাদিগকে শিখাই। আপনাদের দায়িত্ব, আপনারাও সেই তফসীর শিখুন এবং উহাকে অন্তরে স্থান দিন ; তারপর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের প্রচার করিয়া যান। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের সকলকে এই কথাগুলি বুঝিবার এবং সেগুলির উপর আমল করিবার তৌফিক দিন। আমীন।

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

মূল ঃ হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাজিঃ)

অনুবাদ : জনাব আহ্সানুল্লাহ্ সিকদার

১৯৩৬ ইং সালের ১৩ই নবেম্বর বাদ মাগরিব কাদিয়ানের মেহমানখানার সামনে স্থানীয় সুধীবৃন্দ এবং বহিরাগত মেহমানগণের সামনে হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাজিঃ) "যিকরে হাবিব" সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়াছিলেন ঐ ভাষণের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমি স্বয়ং ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই ভাষণ শ্রবন করিবার সৌভাগ্য লা'ভ করিয়াছিলাম।—অনুবাদক। হযরত মুফতি সাহেব (রাজিঃ) বলেন :—

১। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মনোযোগ সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট থাকিত

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সংসর্গে থাকার ফলে এবং হুজুরের পবিত্র চাল চলন দর্শনে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা এই যে, হুজুর আপন মনোযোগ সর্বদা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ রাখিতেন। যেমন, একবার 'ভেরা' (ভেরা পাঞ্জাবের একটি শহর এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রাজিঃ) ও হযরত মুফতি সাহেবের জন্মস্থান।—অনুবাদক) হইতে এক ব্যক্তি কাদিয়ানে আসিলেন, হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিলেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে শুভাগমন করিয়াছেন, এবং কত দিন এখানে থাকিবেন? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমি ভেরা হইতে আসিয়াছি। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ভেরা এখান হইতে কত দূর? লোকটি ভেরা হইতে কাদিয়ানের দুরত্ব বলিলেন। অন্য এক সময় আর এক ব্যক্তি ভেরা হইতে কাদিয়ান আসিলেন। তখন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও হুজুর ঐ একই প্রশ্ন করিলেন যে, ভেরা এখান হইতে কত দূর? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম ব্যক্তি বর্ণিত দূরত্ব হুজুর ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আরও প্রতিয়মান হয় যে, হুজুরের মনোযোগ সর্বদা আল্লাহ্তায়ালার প্রতিই নিমগ্ন থাকিত। দুনিয়ার কথা-বার্ত্তার প্রতি মোটেই খেয়াল থাকিত না।

২। কেতাব 'নূরউদ্দীন' এর প্রণয়ন

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবিত কালে জনৈক মুসলমান আবদুল গফুর আর্য সমাজ ভুক্ত হইয়াছিল, এবং "তরকে ইসলাম" নামক একটি বই লিখিয়াছিল। মুসলমানগণও ঐ বইয়ের উত্তর লিখিয়াছিল হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর মজলিসে 'তরকে ইসলাম' নামক বইয়ের বিষয় উত্থাপিত হইলে হুজুর হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রাজিঃ)-কে বলিলেন, এই বইয়ের উত্তর লিখুন। হযরত মৌলভী সাহেব উত্তর লেখা আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক দিন যাহা লিখা হইত, হুজুর তাহা শুনিতেন। লেখা শেষ হইলে হুজুর স্বয়ং উহা প্রেসে দিবার আদেশ দিলেন। পরন্তু ঐ কেতাব প্রেসে দেওয়া হইলে, হুজুর নিজেই কেতাবের নাম রাখিলেন "নূরউদ্দীন"। এক বৎসর পর কোনও এক পত্রিকাতে উক্ত আবদুল গফুর সম্বন্ধে কোনও এক বিষয় প্রকাশিত হইল। (বিষয়টি এখন আমার স্মরণ নাই) আমি হুজুরের সহিত ঐ বিষয়ে আলাপ করিলে হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল গফুর কে? আমি বলিলাম, ঐ আবদুল গফুর, যে মুসলমান হইতে আর্য সমাজী হইয়াছে এবং নাম রাখা হইয়াছে ধরমপাল। সে 'তরকে ইসলাম' নামক বইটিও লিখিয়াছে। হুজুর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ বইয়ের কি কেহ উত্তরও লিখিয়াছেন? আমি বলিলাম, হুজুর স্বয়ং এই বইয়ের উত্তর লিখিবার জন্য হযরত মৌলভী সাহেবকে আদেশ দিয়াছিলেন। কেতাব প্রকাশিত হইলে হুজুরই নাম রাখিয়াছিলেন 'নূরউদ্দীন'। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুরের খেয়াল সর্বদাই নিপতিত থাকিত আল্লাহ্তায়ালার প্রতি। কেতাব লিখিতেন শুধু এই জন্য যে, দুনিয়া দারুল আসবাব (উপকরণের স্থান)। আসলে হুজুরের মনোযোগ এবং ভরসা আল্লাহ্তাআলার উপরই নিবিদ্ধ থাকিত, এবং উপকরণ ও আসবাবের প্রতি কখনো ভরসা করেন নাই এবং খাদেমগণকেও বলিতেন যে, খোদার প্রতি ভরসা কর। আসবাবের প্রতি ভরসা করিওনা।

৩। হুজুরের সরলতা

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আপন বন্ধুগণের সহিত এমন ভাবে উঠা-বসা চলা-ফেরা করিতেন যে, কোন নূতন লোক আসিলে বুঝিতে পারিতেন না যে হযরত মির্জা সাহেব কে। বসিতেনও খুবই সরলতার সহিত। একবার হযরত মৌলভী আবদুল করীম (রাজিঃ) মসজিদ মোবারকের মেহরাবে উপবিষ্ট ছিলেন এবং একটু দূরে বসা ছিলেন

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)। বাহির হইতে এক ব্যক্তি তাড়া হুড়া করিয়া আসিয়া হযরত মৌলভী সাহেবের সহিত মোছাফা করিলেন। মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি মনে করিয়া আমার সহিত মোছাফা করিলেন? হযরত্ সাহেব আমি নই। বরং ঐ যে হযরত সাহেব বসিয়াছেন। ইহা দ্বা'রা প্রমাণ হয় যে আম্বিয়া কিভাবে আপন বন্ধুগণের সহিত সরলতার সহিত জীবন যাপন করেন।

৪। আপন বন্ধুগণের সেবা

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বন্ধুগণের অতিশয় খেদমত করিতেন। একবার আমি হুজুরের দর্শনার্থে কাদিয়ান আসিলাম। মসজিদ মোবারকে হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে হুজুর বলিলেন, মুফতি সাহেব! আপনার বোধ হয় ক্ষুধা লাগিয়াছে। আমি আপনার জন্য খাবার নিয়া আসিতেছি। আমি মনে করিলাম, কোন চাকরানী দ্বারা খাবার পাঠাইয়া দিবেন। হুজুর মসজিদ সংলগ্ন একটি ছোট দরজা দ্বারা মসজিদে যাতায়ৎ করিতেন। কয়েক মিনিট পর ঐ দরজা খুলিল। তখন আমি কি দেখিলাম? আমি দেখিলাম যে, হুজুর স্বয়ং খাবার ট্রে হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। ট্রেতে রুটি এবং তরকারী ছিল। দেখা মাত্র আমার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। আমার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া হুজুর বলিলেন, মুফতি সাহেব! আপনি কাঁদেন কেন? আমি তো আপন বন্ধুগণের খেদমত এই জন্য করি যেন তাহারাও আপন বন্ধুগণের খেদমত করেন। আমি তো মানুষের খেদমত করিবার জন্যই আসিয়াছি। আমি বলিলাম, কত আশ্চার্যের বিষয় খোদার মসীহ আমার ন্যায় নগণ্যব্যক্তির খেদমত করিতেছে। মোট কথা আম্বিয়া আসেন দুনিয়ার খেদমতের জন্যই। তাঁহারা দুনিয়ার জন্য নমুনা স্বরূপ হইয়া থাকেন যেন তদ্দর্শনে মানুষ শিক্ষা লাভ করে।

৫। হুজুর ছিলেন উৎকৃষ্টতম আখলাকের নমুনা

একবার আমি লাহোর হইতে কাদিয়ান আসিলাম কয়েকদিন অবস্থানের পর কাদিয়ান হইতে ফিরিবার সময় হুজুর জৈনিক খাদেমকে বলিলেন, মুফতি সাহেবের রাস্তায় খাওয়ার জন্য রুটি নিয়া আস। খাদেম রুটি নিয়া আসিল। কিন্তু রুটি বাঁধিয়া দিবার জন্য

কোন রুমাল ছিল না। হুজুর বলিলেন, মুফতি সাহেবের জন্য রুমাল আন নাই কেন? ঝটপট আপন মাথার পাগড়ী খুলিয়া রুটি বাঁধিবার জন্য প্রয়োজনীয় টুকরা পাগড়ী হইতে ছিঁড়িয়া ঐ টুকরা দ্বারা রুটি বাঁধিয়া ছিলেন। (ঐ টুকরা হযরত মুফতি সাহেবের নিকট রক্ষিত ছিল। অনুবাদক) এই ছিল নবুওতের পূর্ণ আদর্শ। আমি তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নবী বলিয়া বিশ্বাস করি।

৬। আমার দৃষ্টিতে তো হযরত সাহেব নবী

একটি ঘটনা এখনই আমার মনে পড়িল। 'ডাঙ্গা'তে (একটি গ্রামের নাম) জৈনিক মুসলমান যুবক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার মাতার অতিশয় মনোকষ্ট এবং ছেলেকে কিরূপে পুনরায় মুসলমান করা যায় এই চিন্তায় অধীর হইয়া যায়। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, কাদিয়ানে এক বুজুর্গ আছেন—মীর্যা গোলাম আহমদ। তিনি খৃষ্টানগণকে দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিয়া থাকেন। তুমি ছেলেকে নিয়া কাদিয়ান যাও। মহিলাটি এই সংবাদ শুনিয়া আপন পুত্র সহ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হইল। মহিলাটি হযরত সাহেবের বাড়ীতেই থাকিত, এবং হুজুর ছেলেকে ইসলামের সৌন্দর্য এবং খৃষ্ট ধর্মের অসারতা সম্পর্কে বুঝাইতেন। ছেলেটি হুশিয়ার ছিল। সে পুনরায় মুসলমান হইল। মহিলাটি হুজুরের বাড়ীতে থাকিত এবং হুজুরের চাল চলন আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি খেয়াল করিত, এবং বলিত যে "আমার দৃষ্টিতে তো হযরত সাহেব নবী।" আমিও ঐ মহিলাকে উত্তরে বলিতাম, হা হযরত সাহেব নবী।

৭। নিত্য নূতন নিদর্শন

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জীবিতাবস্থায় আমরা নিত্যনূতন নিদর্শন দেখিতাম এক কথায়, হুজুর সকালবেলা বলিতেন এবং আমরা বিকালে পূর্ণ হইতে দেখতাত। কোন ইলহাম সন্ধ্যাকালে বর্ণনা করিতেন, এবং উহা পরদিন সকালে পূর্ণ হইতে দেখিতাম। এবং আমাদের ইমান তাজা হইত।

৮। মেহমানের প্রতি মহব্বত

হুজুর মেহমানগণকে অতিশয় মহব্বত করিতেন। এক বার আমি কাদিয়ানে আসিলাম। শীতের মওসম ছিল। আমরা যে হুজুরাতে ছিলাম তার পাশের হুজরাতে

হুজুর থাকিতেন। এক হুজুরার কথা বার্ত্তা অন্য হুজরা হইতে শুনা যাইত। ঐ দিন বাহির হইতে আরও অনেক মেহমান আসার দরুন হযরত ওস্মোল মোমেনীন ঘাবড়াইয়া গেলেন যে এত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইবে কেমন করিয়া। ইহাতে হুজুর বলিলেন, মেহমানের সেবা যত্ন করিবে। তারপর এক কাহিনীও বলিলেন যে, একবার এক ব্যক্তি জঙ্গল দিয়া সফর করিতেছিল। জঙ্গলেই তাহার রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য সে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নিল। তাহার নিকট না ছিল শীত নিবারণের কোন কিছু, আর না ছিল খাদ্য দ্রব্য। ঐ বৃক্ষের উপর এক জোড়া পাখী ছিল নর ও মাদী। ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া পাখী যুগল নিজেরা আলাপ করিতে লাগিল যে, ঐ ব্যক্তি আমাদের মেহমান। তাহার খেদমত করা আমাদের ফরজ। আলাপ আলোচনার পর সাব্যস্ত করিল যে এই ব্যক্তির শীত নিবারণের জন্য চল আমাদের বাসা ভাঙ্গিয়া খরকুটা নিচে ফেলিয়া দেই যেন এই ব্যক্তি এই খড়কুটা দ্বারা আগুণ জালাইয়া শীত নিবারণ করিতে পারে। পরন্তু তাহারা তাহাদের বাসা ভাঙ্গিয়া নিচে ফেলিয়া দিল এবং আগুণ জ্বালাইয়া শরীর তাপিতে লাগিল। তার পর পাখী যুগল বলিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। তাহার খাবার কি বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে? আলোচনার পর সাব্যস্ত হইল যে, চল আমরা উভয়ে এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তবে আমাদিগকে ভুনিয়া মেহমান আহার করিতে পারিবে। এবং উভয়ে ঝাপ দিয়া অগ্নিতে পতিত হইল। অতঃপর হুজুর বলিলেন, ঐ পাখী যুগল নিজেদের বাসা তো দিলই। এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিষর্জন দিল। তদ্রূপ আমাদের কর্তব্য মেহমানের সর্বপ্রকার খেদমত করা। কাদিয়ানে আগত মেহমান সম্বন্ধে হুজুর বলিতেন, মানুষের কাদিয়ান আসাও এক নিদর্শন। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা জানাইয়া ছিলেন, মানুষ দূর হইতে আসিবে, এবং এত অধিক সংখ্যক আসিবে যে, রাস্তায় গর্ত্ত হইয়া যাইবে। মেহমান সম্বান্ধ আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। একবার বাহির হইতে এক মেহমান আসিল। হুজুর হাফেজ হামেদ আলী নামক খাদেমকে বলিলেন, মেহমানের রাজাই দাও। হামেদ আলী বলিলেন, হুজুর! এই ব্যক্তিকে রাজাই দেওয়া যায় না। কারণ এই ব্যক্তি রাজাই লইয়া রাত্রিকালে পলায়ন করিবে। হুজুর বলিলেন, এই ব্যক্তি যদি রাজাই লইয়া পলায়ন করে, তবে নিজেই কৃত-কর্মের কুফল ভোগ করিবে।

আহমদী

৩১শে জুলাই—১৯৭৬ ইং

৯। আমেরিকার ফুল

অমেরিকাতে এক মহিলা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মিস। তিনি হযরত সাহেবের খেদমতে অনেক চিঠি পত্র লিখিতেন। একবার তিনি পত্রের খামের ভিতরে ভরিয়া কিছু ফুলও পাঠাইলেন। হুজুর বলিলেন, এই ফুল একটি নিদর্শন।

নোট - হযরত মুফতি সাহেবের নিকট শুনাইয়াছি ঐ ফুল পাঠাইবার পর হুজুর ঐ মহিলার নাম রাখিয়াছিলেন মিস গোলাব।--- অনুবাদক।

১০। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়

আমি যখন সর্বপ্রথম কাদিয়ান আসি, তখন শীতের মওসুম ছিল. আর একজন মেহমান ছিলেন সৈয়দ ফজল শাহ সাহেব। হুজুর যখন প্রাতঃকালীন ভ্রমনে বাহির হইলেন, তখন আমরা সঙ্গে ছিলাম। রাস্তায় সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে মাহদীর জামানায় পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হইবে। ইহার অর্থ কি? উত্তরে হুজুর বলিলেন, গ্রহ-উপগ্রহ স্থান পরিবর্তন করে না। এই হাদিসের অর্থ হইল, সূর্য অর্থ ইসলামের সূর্য, যাহা পশ্চিমদিকে উদিত হইবে। অর্থাৎ ইউরোপবাসী ইসলাম গ্রহণ করিবে।

১১। ইউরোপীয়গণের মুসলমান হইবার খাহেশ

একবার হযরত মৌলবী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব তদ্বীয় জনৈক আত্মীয়কে হযরত সাহেবের খেদমতে একটি সুসংবাদ (মবাহেসাতের তাহার বিজয় সম্বন্ধে) জানাইবার জন্য পাঠাইলেন। আমি তখন কাদিয়ানে ছিলাম এবং হুজুরের নিকট বসা ছিলাম। তখন হুজুর একটি গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় ঐ ব্যক্তি আসিয়া আওয়াজ দিলে হুকুর আমাকে বলিলেন, দেখুন, কে আসিয়াছে এবং কেন আসিয়াছে? আমি ঐ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার যাহা বলিবার তাহা শুধু হযরত সাহেবকে বলিব, আপনার নিকট বলিবনা। আমি হুজুরের নিকট গিয়া এই উত্তর শুনাইলে হুজুর আমাকে দ্বিতীয়বার, এমনকি তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেন এবং বলিলেন, আপনি গিয়া বলুন, ঐ সুসংবাদ আপনাকে বলিতে। আমি এখন যাইতে গেলে ক্ষতি হইবে। অবশেষে ঐ ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া আসল সংবাদ আমাকে জানাইলেন যে, অমুক মোবাহেসাতে আমাদের বিজয় হইয়াছে। অতঃপর আমি হযরত সাহে-

বের খেদমতে এই সংবাদ জানাইলে পর হুজুর বলিলেন, আমি তো এই সুসংবাদকে মনে করিয়াছিলাম যে ইউরোপবাসী মুসলমান হইয়াছে। সর্বদা হুজুরের এই আকাঙ্খাই থাকিত যে মানুষ মুসলমান হউক। ইউরোপীয়গণও মুসলমান হউক।

১২। হুজুরের আরবী জ্ঞানের প্রতি জনৈক আরবের বিশ্বাস স্থাপন

কাদিয়ান মসজিদের এক কামড়াতে জনৈক আরব থাকিতেন, ঐ ব্যক্তি খুবেই হুঁসিয়ার ছিলেন। হযরত সাহেবের কোন কোন আরবী গ্রন্থ পাঠ করিবার পর ঐ ব্যক্তি বলিলেন যে, এই সমস্ত গ্রন্থ মির্জা সাহেব নিজে লিখেন নাই! বরং অন্য লোক দ্বারা লিখাইয়াছেন। একবার তিনি দোয়াত কলম কাগজ নিয়া আসিলেন এবং হযরত সাহেবকে বলিলেন, এখানে আপনি আরবী লিখুন। হুজুর বলিলেন, আমি তো এইভাবে লিখিনা। খোদাতা'আলা লিখাইলে লিখি। হইতে পারে যে এই ভাবে লিখিলে আমার হাত অবশ হইয়া যাইতে পারে। এক বার ঐ ব্যক্তি আরবীতে একটি প্রশ্ন লিখিয়া হুজুরকে উত্তর দিবার জন্য পেশ করিলে হুজুর ঐ মজলিশেই আরবীতে উত্তর লিখিয়া দিলন। অতঃপর ক্রমাগত কয়েক দিন ঐ ব্যক্তি আরবীতে প্রশ্ন করিতে থাকেন এবং হুজুর আরবীতেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে থাকেন। অবশেষে ঐ ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, সত্যই হুজুর আরবী লিখিতে পারেন। (আলহাকাম, নভেম্বর ১৯৩৬ ইং)

১৩। দুনিয়ার কাজ শেষ হয় না

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইতে যে ভক্ত বৃন্দ আসিতেন, তাঁহারা কাদিয়ান হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিদায় চাহিলে হুজুর বলিতেন, আরও কিছু দিন থাকুন। ইহাতে সাধারণতঃ হুজুরের এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকিত যে, যেহেতু নবুয়তের জামানা, হইতে পারে যে আরও কিছু দিন থাকিলে কোন নূতন নিদর্শন দেখিতে পারেন। অথবা ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন ইলহাম হইতে পারে। অথবা তাঁহার জন্য কোন খাছ দোয়ার মওকা পয়দা হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ সম্বন্ধে বলিতেন যে, আমার অমুক অমুক কাজ করিতে হইবে। কাজেই না গিয়া উপায় নাই। তবে হুজুর বলিতেন, দুনিয়ার কাজ-কর্ম তো কাহারো দ্বারা শেষ হয়না। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, পেছনে এমন অনেক কাজ রাখিয়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, যে সমস্ত কাজ সম্বন্ধে মনে করিত যে এই সকল জরুরী কাজ সমাধা না করিলেই চলিবেনা। ঐ ব্যক্তি দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কাজ দুনিয়াতেই থাকিয়া যায়।

(হযরত মুফতি সাহেব রাজিঃ) প্রদত্ত ১৯৩৫ ইং সালের সালানা জলসার বক্তৃতা হইতে গৃহীত)

পবিত্র রমযানের গুরুত্ব ও কর্তব্য

রমযান বিশেষভাবে দোওয়ার কবুলিয়তের মাস। اذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان এ মাসে দোওয়ার সুযোগ ও সর্বাকি এবং উপযুক্ত পরিবেশ ও তার জন্য আধ্যাত্মিক উন্মে'ষর অণুকুল যাবতীয় উপকরণ ও এ পবিত্র মাসেই পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত। এ'তেকাফের শেষ দশ দিন এবং মহাকল্যাণ ও গৌরবময় লাইলাতুল কদর মুমেনদের মাসব্যাপী এবাদত ও সাধনের পূর্ণ বিকাশ ও পুরস্কার বহণ করে।

চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম রমযান। এই মাসে কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হইয়াছিল এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রত্যেক রমযানে উহার পূর্ব পর্যন্ত অবতীর্ণ অংশ হযরত জিব্রাইল হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর সহিত পণঃআবৃতি করিতেন এবং সর্বশেষ বৎসর রমযানে পূর্ণ কুরআন তাঁহার উপর পুনঃ অবতীর্ণ হয়। شهر رمضان الذى انزل فيه القران আয়াত অনুযায়ী পবিত্র রমযানের সহিত পবিত্র কুরআনের নুযুলের নিবীড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই জন্যই পবিত্র রমযানকে "মাসব্যাপী নুযুলে কুরআন বার্ষিকীর রুহানী উৎসব" বলা চলে। এই মাসে মানব জাতীর শাশ্বত, পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতম হেদায়েত কুরআন শরীফের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য মাসব্যাপী প্রত্যেক মুসলমানের রোযা রাখা ফরয করা হইয়াছে, যাহা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের (আরকানের) অন্যতম। রোজা রাখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধর্মের মূল ভিত্তি তথা তকওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া (لعلكم تتقون)। তাকওয়ার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার মা'রফত অর্জন করিয়া তাঁহার এবাদত ও আজ্ঞানুবর্তিতার মাধ্যমে নিজ আত্মায় তাঁহার প্রতি অতুলনীয় ভয়-ভালবাসা ও ভক্তি সৃষ্টি করা এবং তাহাতে উন্নতি লাভ করিয়া তাঁহার প্রীতি ও সন্তুষ্টির আশ্রয়ে পবিত্র ও পূর্ণ শান্তিপ্রাপ্ত জীবনের অধিকারী হওয়া। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্যই রমযানের রোযার সাধনা। রোযা রাখার অর্থ সূর্য-উদয় (ফজর) হইতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ দেহ ও মস্তিষ্ক

সম্পন্ন মুসলমানের পানাহার ও স্ত্রীগমন পরিত্যাগ করা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ বিষয় যেমন ঝগড়া বিবাদ, মিথ্যা, গালমন্দ, গীবত, পরনিন্দা, কুচিন্তা, কুবাক্য, জুলুম অত্যাচার, উৎকোচ গ্রহণ ও অবাঞ্ছিত ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিয়া আল্লাহ তায়ালার প্রেম, জিকর-আজকার, তাসবীহ, তাহ্মীদ ও দরূদ প্রেরণে যথাসাধ্য চেষ্টিত থাকা। অন্যথায় রোজা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে ভঙ্গ হইয়া যায়। (আল-হাদিস)। এতদ্ব্যতীত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাবন্দি, নফল নামাজ, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও কুরআন শরীফের অধিক তেলাওয়াত এবং অধিকতর দান-খয়রাত করাও রেজার এবাদতের জরুরী অংশ হিসাবে গণ্য। রমযান বিশেষভাবে দোওয়ার কবুলিয়তের মাস। দোওয়ার সুযোগও সর্বাধিক এবং উহার উপযুক্ত পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক উন্মেষের অনুকুল যাবতীয় উপকরণও এই পবিত্র মাসে পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত। এ মাসের এ'তেকাফের শেষ দশ দিন এবং মহা গৌরব ও কল্যাণময় লাইলাতুল কদর মোমেনদের মাসব্যাপী সাধনার পূর্ণ বিকাশ ও পুরস্কার বহণ করে!

সেহরী খাওয়া ফরজ না হইলেও সেহরীতে বরকত রাখা হইয়াছে। (আল-হাদিস)। রসুল করীম (সাঃ আঃ) সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতারী করিতেন এবং ইহার অনুশীলনকে তিনি উম্মতের সুলক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যতদিন আমার উম্মত দেরীতে সেহ্রী খাইবে এবং শীঘ্র ইফতারী করিবে ততদিন তাহারা ভাল অবস্থায় থাকিবে। এই আদেশের বাহ্যিক অনুশীলনের লক্ষ্য হইল কমী-বেশী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মধ্যমপন্থি অর্থাৎ সেরাতে মুস্তাকিমের কর্মতৎপর ও সর্তকশীল যাত্রী হওয়া। এই ভাবে পবিত্র রমজান মাসের সাধনা ও উদ্‌যাপন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে মহান কুরআনের আলোকে আলোকিত এবং আ'ল্লাহ্ ও রসুলের অভিপ্রেত সকল গুণে ও কল্যাণে ভুষিত করে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকেই এই মহান পবিত্র মাসের পূর্ণ মর্যদা দনের এবং উহার যাবতীয় কল্যাণে ভূষিত হওয়ার তৌফিক দিন। আমীন।

— মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
(সদর মুরুব্বি)

আহ্মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে, এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar